DEPARTMENT OF HISTORY
Course : Both Honours & Programme
Semester : IV
Paper/Core Course : SEC-2-I (Unit- 2)
Name of the Teacher : Nilendu Biswas
[1st Phase]
Topic : ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা সঙ্গীতের বিকাশ

✠ লালন ফকিরের সঙ্গীত সাধনা ও হিন্দু-মুসলিম ধারার সংমিশ্রণ ঃ এই পৃথিবীতে এমন সব মহামানব আসেন, যাঁরা আপন প্রাণের আলোয় অন্তরময় জীবন-দেবতার অন্বেষণ করেন । সব শাস্ত্রে তাই আপন অন্তরময় সত্তার উপলব্ধিকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলা হয়েছে । সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাউল মতবাদের সূচনাকাল ধরা হয় । কেউ কেউ মনে করেন নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রই বাউল মতবাদকে জনপ্রিয় করেছিলেন । উনিশ শতকে বাউল মতবাদ লালন ফকিরের সাধনায় পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে । ১৭৭৫ খ্রি. কাছাকাছি কোন এক সময় কুষ্ঠিয়ার কুমারখালির নিকট ভাঁড়রা গ্রামের ধর্মপাড়ায় লালন ফকিরের জন্ম ।

লালন ফকিরের জীবন কাহিনি নিয়ে নানা জনশ্রুতি প্রচারিত আছে । জানা যায় লালন হিন্দু পরিবারের কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয় । অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ হওয়ায় লালন শ্রীক্ষেত্র তীর্থ দর্শনে গিয়ে ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন । তাঁর সঙ্গীসাথীরা লালনকে ফেলে পালায় এবং গ্রামে এসে প্রচার করে যে লালনের মৃত্যু হয়েছে । বসন্ত রোগে আক্রান্ত লালনকে পথে পড়ে থাকতে দেখে সিরাজ সাঁই নামে এক নিঃসন্তান মুসলমান নিজগৃহে নিয়ে আসেন । সেখানে বেশকিছু দিন থেকে সুস্থ হলে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন । যেহেতু লালন মুসলমানের আশ্রিত ছিলেন এবং তাঁদের দেওয়া অন্নজল গ্রহণ করেছেন, তাই লালনকে আশ্রয় দিতে নিজের পরিবার অস্বীকৃত হন । বাধ্য হয়ে লালন আবার সিরাজ সাঁই-এর নিকট ফিরে যান ।

সিরাজ সাঁইকে গুরু মনে করে লালন নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে ফিরে এসে কুষ্ঠিয়ার গোরাই নদীর তীরবর্তী সেউড়িয়া গ্রামে এক মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করে বাউল সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন । লালন ফকির তাঁর গানে যে ভেদ-বুদ্ধিহীন মানব জাতির কথা বলেছেন, তার রস-সৌন্দর্য শুধু বাংলার লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেনি, ভারতীয় লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা এক অমূল্য সম্পদ । লালন তাঁর গানের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন-- 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে !' লালনের কাছে জাত-পাতের ভেদ রেখা ছিল মিথ্যা, মানুষই ছিল তাঁর কাছে একমাত্র সত্য । তিনি সেই মনের মানুষকেই খুঁজেছেন দেশ-বিদেশে এবং অন্তরের অন্তরলোকে ।

একদিকে সুফি তত্ত্ব, অন্যদিকে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সাধনা ও লৌকিক সাধনার মিশ্রণে বাউল সহজিয়াদের মতবাদ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয় । সুফি মতবাদের ভাবধারায় গড়ে উঠেছে 'মারফতী' গান, আবার বাউল বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্মের ভাবধারায় গড়ে উঠেছে 'দেহতত্ত্ব' গান । তাই লালন শাহের গানে হিন্দ-মুসলিম মিলিত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়-- 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে । লালন বলে জাতের কীরূপ দেখলাম না তা নজরে ।।'

রবীন্দ্রনাথ লালন সম্পর্কে বলেছেন, 'এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি । এ মিলন সভা সমিতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে । এ গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলিয়াছে । কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাধেনি ।'

✠ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ঃ যে মহান পুরুষ নিমজ্জমান উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে উদ্ধার করে, অধিকাংশ সঙ্গীত প্রতিভূদের সংকীর্ণমন্যতা ও নীচতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে সারা জীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি হলেন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে । ১৮৬০ খ্রি. ১০ অক্টোবর বোম্বাইয়ের বালকেশ্বর নামক স্থানে এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে ভাতখণ্ডের জন্ম হয় । বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গেই ভাতখণ্ডে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন এবং গান, সেতার ও বাঁশীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন ।

কর্মজীবন ওকালতি দিয়ে শুরু করলেও সঙ্গীত সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভাতখণ্ডে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে প্রাচিন সঙ্গীত সংগ্রহ এবং সঙ্গীত গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করতে থাকেন । এছাড়াও বিভিন্ন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের সেবার মাধ্যমে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন । সংগৃহীত ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, লক্ষণগীত প্রভৃতি একত্রিত করে 'ক্রমিক পুস্তক

মালিকা' নামক গ্রন্থে স্বরলিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন । তিনি ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতকে শাস্ত্ররূপ প্রদান করার জন্য এক অতি সহজবোধ্য, অভিনব, বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বরলিপি পদ্ধতি রচনা করেন, যা বর্তমানে সর্বভারতে 'ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি' নামে প্রচলিত ।

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা করার সময় তিনি পন্ডিত বেঙ্কটমখীর ৭২টি মেল সম্বন্ধে অবগত হয়ে এক নতুন আলোর সন্ধান পান । ফলে তৎকালীন প্রচলিত রাগ-রাগিণী পদ্ধতি পরিহার করে তিনি বেঙ্কটমখীর ৭২টি মেল থেকে ১০টি ঠাট গ্রহণ করেন । উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত সমস্ত রাগগুলিকে তিনি বিজ্ঞান সম্মতভাবে এই ১০টি ঠাটে বিভাজন করেন ।

রেডিও প্রচলনের আগে ভাতখণ্ডে রাগ-রাগিণী সম্পর্কে ওস্তাদদের মতবিরোধ ও তর্কের সমাধানকল্পে এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরাণাকে একটি সর্ববাদীসম্মত নিয়মের অধীন করার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খ্রি. 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন'-র আয়োজন করেন । এই সম্মেলনে 'অখিল ভারতীয় সঙ্গীত একাডেমী' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

তিনি বহু সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক রচনা করেছেন । তার মধ্যে 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি', 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা', 'ভাতখণ্ডে সঙ্গীত শাস্ত্র', 'অভিনব রাগমঞ্জরী', 'লক্ষণগীত', 'স্বরমালিকা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি তাঁর রচনায় 'চতুর পন্ডিত', বিষ্ণু শর্মা', 'মঞ্জরীকার' প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন । ১৯৩৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভাতখণ্ডে দেহত্যাগ করেন ।

পরিশেষে ভগীরথ যেমন হিমালয়ের গুহা থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সেই পুণ্য সলিলে সারা ভারতের অঙ্গ বিধৌত করেছিলেন । পন্ডিত ভাতখণ্ডে ঠিক তেমনি তৎকালীন রক্ষণশীল ওস্তাদদের কঠোর প্রহরাবেষ্টিত অন্ধকার গুহা থেকে উদ্ধার করে সঙ্গীত-নির্ঝরিনীকে ভারতের আপামর জনসাধারণের দ্বারে পৌছে দিয়ে সকলকে কৃতার্থ করেছেন ।

✠ **যদুভট্ট ঃ** 'যদুভট্ট' নামে সর্বাধিক পরিচিত যদু ভট্টাচার্য ১৮৪০ খ্রি. বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য একজন উৎকৃষ্ট বীণা বাদক, উচ্চস্তরের সঙ্গীতশিল্পী ও মার্গ সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । পিতার সৌজন্যেই যদুভট্টের মনে সঙ্গীত জগতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় । পিতার কাছে তিনি সুরবাহার, সেতার, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীত অনুশীলন করে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে সমান দক্ষতা অর্জন করেন । প্রথম যৌবনে তিনি গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্করের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন । সঙ্গীতবিদ্যায় পান্ডিত্য অর্জনের জন্য তিনি কাশী, গোয়ালিয়র, জয়পুর ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন । ফলে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় ।

যদুভট্ট কেবল গুরুর নিকট শিক্ষায় সন্তুষ্ট ছিলেন না, নানা ঘরাণার এবং ঢঙের সামঞ্জস্য বিধান করে নিজস্ব একটা ধারা ও গায়কীর প্রচলন করেন যা শ্রোতামাত্রকেই অভিভূত করত । এই কারণে সারা বাংলা এবং বাংলার বাইরেও তাঁর যশ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল । ২২ বছর বটসেতিনি সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করে সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন । বাঙালী হয়েও তাঁর রচিত হিন্দি ধ্রুপদ গান রচনা নৈপুণ্যে বিখ্যাত হিন্দুস্থানী রচয়িতাদের গীতরচনাকেও ম্লান করে দিয়েছে । পঞ্চকোটের রাজা যদুভট্টকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দান করেন ।

ঠাকুর বাড়ীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদুভট্টের গান শুনে অভিভূত হয়ে যদুভট্টকে ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গীত শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন । ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য যদুভট্টকে ত্রিপুরায় আহ্বান করেন । যদুভট্টের গানে মুগ্ধ হয়ে তিনি যদুভট্টকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন । ত্রিপুরায় থাকাকালীন তানসেন বংশীয় বিখ্যাত রবারী কাশীম আলি খাঁ ত্রিপুরা রাজদরবারের রবার বাদক ছিলেন । তিনি যা বাজাতেন তা শুনেই যদুভট্ট গান আরম্ভ করতেন । এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কাশিম আলি খাঁ ত্রিপুরা ত্যাগ করে চলে যান । অবশ্য যদুভট্ট ত্রিপুরার মহারাজার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও ত্রিপুরা দরবারে থাকতে অস্বীকৃত হন ।

সঙ্গীত শিক্ষক রূপে ঠাকুর বাড়ীতে থাকাকালে যদুভট্ট রবীন্দ্রনাথকে মার্গ সঙ্গীতে শিক্ষা দান করেন । রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদুভট্টের রচিত খাম্ভারবাণী ও অন্যান্য ধ্রুপদের সুর ও ছন্দ নিয়ে বাংলা গান রচনা করেন । তিনি ঠাকুর বাড়ী এবং ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন । তিনি যে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন তা নয়, তিনি হিন্দি ও বাংলা ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করেছেন ।

অনন্যসাধারণ প্রতিভার গুণে যদুভট্ট সর্বভারতীয় খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন । সমসাময়িক আর কোন বাঙালীর পক্ষে এই সম্মান পাওয়া সম্ভব হয়নি । ১৮৮০ খ্রি. প্রথম দিকে তিনি বিষ্ণুপুর ফিরে আসেন এবং কয়েক মাস রোগসজ্জায় ভুগে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যদুভট্টের দান অমর কীর্তিরূপে চিরদিন বাঙালীর গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে ।

---------- প্রশ্নাবলী ----------

রচনাধর্মী প্রশ্ন (মান - ১০)

১) লালন ফকিরের সঙ্গীত সাধনায় কীভাবে হিন্দু-মুসলিম ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল ?
২) উনিশ শতকের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে-এর অবদান আলোচনা করো ।
৩) ১৯ শতকের সঙ্গীত চর্চায় যদুভট্টের অবদান আলোচনা করো ।

(.....**Contd**)